তানজিনা নূর-ই সিদ্দিকী

সাঁকো

গল্প

উঠানে গামলাটা রাখছস শীলা? ঘর থেকে মায়ের চড়া গলার আওয়াজে ছন্দপতন হয় শীলার ভাবনায়। সে বসেছিল বারান্দায় পেতে রাখা পুরনো বেতের একমাত্র চেয়ারটায়। সাদা কুশন থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ আসে। শীলা জবুথবু বসে আকাশ দেখছিল। মেঘ থমথম, যেকোন সময় বৃষ্টি আসবে। শীলার মন ক্রমেই বিষণ্ন হতে থাকে। এরকম বিষণ্নতায় তার শৈবালকে মনে পড়ে। শৈবাল তার বছর দুয়েকের বড় হবে, একই স্কুলে পড়ে। শৈবাল আজ স্কুলে যাবে কিনা, ভাবে শীলা। শৈবাল সাদা ফুলহাতা শার্ট আর নেভিব্লু ফুল প্যান্ট পরে, বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়। শীলা যায় মাটির পথ পেরিয়ে। শহরের প্রধান সড়কে ওঠার পথটা ওদের জন্য একটু কঠিনই হবার কথা। কিন্তু শীলার কেমন যেন রোমাঞ্চকর লাগে সেই মাটির পথ হেঁটে যখন সে সবুজ জঙ্গলে ঘিরে থাকা খালের কাছে যায়। এরপর একটা নড়বড়ে সাঁকো, বাঁশের তৈরি। খুব সাবধানে পায়ের স্লিপারগুলো খুলে হাতে নেয় শীলা। সাঁকোতে পা বাড়ালেই সবুজ গাছের গন্ধ তার নাকে এসে লাগে, পানির নিচ থেকে লম্বা ঘাসগুলো দুলতে থাকে। শীলার খামখেয়ালি পা পড়তেই বাঁশের সাঁকো শব্দ করে ওঠে, শীলার মনে হতে থাকে, সাঁকো তাকে পার করে দেবে অনায়াসে। ওই চার পাঁচ মিনিটের যাত্রায় শহরের সাথে সংযোগ করে দেওয়া সাঁকোটা বৃষ্টিতে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হবে আজ। খালের পানির ঘোলা ভাব কেটে যাবে। শীলা যতটা না স্কুল ভালোবাসে, তার চাইতে বেশি তার ভালো লাগা, ওই সাঁকো পার হয়ে যেতে আনমনে।

শীলার মা হন্তদন্ত হয়ে টিনের ঘর থেকে বেরোয়। শীলার ডান বাহুতে নিজের শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ডান হাত দিয়ে সজোরে বাড়ি দেয় সে। শীলা থতমত খেয়ে বাম হাতে তার ডান বাহুতে ঘষে ঘষে আচমকা আঘাতের ব্যথা কমাতে চেষ্টা করে। করুণ দৃষ্টিতে তাকায় মায়ের দিকে। মাকে তার বড় অচেনা লাগে এরকম মুহূর্তে। সে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায়। এই মা কি তার আসল মা?

-'আই হারামজাদি, তোরে কহন কইসি, গামলা বয়াইতে উঠানে? কথা কানে নেস না? বদমাইশ, সারাদিন শুয়া থাকোস, কোন কথা কস না, ঘরের কামে মন নাই, পড়সও না। তরে দিয়া কিছুই হইব না। কহন কইসি, গামলা বয়াইতে। জমিদারের বেটি, শুইয়া শুইয়া আকাশ দেকতাসে।' রাগে শীলার মায়ের শ্যামলা মুখটা লালচে হয়ে গেছে। শীলা কোন কথা বলে না। এই দেখে শীলার মা আরও ক্ষেপে যায়। 'ঐ হারামি, কথা কস না ক্যান?'

-'আমি কি কমু? কথা কইলেও তো কইবা, মুখে মুখে উত্তর দেই। কইবা না?' শীলার মা আবারও হাত উঁচিয়ে আসে মারতে, 'বদমাইস ছেড়ি, যা বাইর হ, ঘর থিকা, বাইর হ।'

শীলা নাক ফোলাতে থাকে। কেন যে মা এমন করে সে বোঝেনা। না হয় সে ভুলেই গেছে গামলা রাখতে উঠানে। তাতে কি এমন অন্যায়টা হয়েছে যে মা এরকম বাজে আচরণ করল? আস্তেধীরে উঠে দাঁড়ায় সে বেতের চেয়ার থেকে। ততক্ষণে বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে। শীলা হাত

বাড়ায়, টিনের চালার শেইড বেয়ে বৃষ্টির অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জল ওর হাত ভিজিয়ে দেয়। শীলা নেমে যায় উঠানে। তার লাল জামার ভেতরে শরীরের খাঁজ ভিজতে শুরু করে। চোখের কোল থেকে লেপ্টে যায় কাজল। শীলার চোখ ভিজে জল। সে চুল খুলে দেয়। বৃষ্টিতে বেলিফুলের গন্ধ ছড়ায় উঠান জুড়ে।

ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে শীলাদের বাড়িতে তিন গামলা জল তোলা হয়। বড় নীল প্ল্যাস্টিকের ট্যাংকিটাও ভরে ফেলা হয়। ওদের বাড়িতে পানির লাইনে সমস্যা। দুইদিন পাশের বাড়ি থেকে পাইপ বেয়ে পানি নিয়ে এলেও তিনদিনের দিন শীলার মা আর হাসিনা খালার মধ্যে ঝগড়া হয় তো হাসিনা খালা পানির পাইপ বন্ধ করে রাখেন। পানির জোগান বন্ধ হলে শীলা পিতলের কলসি কাঁখে নিয়ে ছোটে পানি আনতে। ওদের বাড়ি থেকে দশ মিনিট হাঁটলে ধানী জমির পাশে শ্যালো মেশিন। শীলার মনে হয়, পানির ফুলকি ঝরে, হাজার তারার মত, হাসতে থাকে পানি। সেখানেও তার দেরি হয়ে যায়। দূর থেকে শৈবাল বাইসাইকেল নিয়ে চলে যায়। শীলা শান্ত বসে তার প্যাডেল চালানো দেখে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেরি হলে আবারও মায়ের ধমক। শীলার একটু গা সওয়া হয়ে গেছে, মা তো ধমক দিবেই। মাঝে মাঝে মা শীলাকে অবাক করে দিয়ে বকা না দিয়ে মাথায় হাত বুলায়। সেই সময়গুলোয় মায়ের নেতানো তাঁতের শাড়ির ভেতর থেকে বুকের ভাঁজ জেগে ওঠে। সংসারের যাবতীয় স্নেহ জমা হয় সেখানে, শীলার মায়ের বুকের গন্ধে মাতাল মাতাল লাগে। মা ছাড়া শীলার যে কিছুই ভালো লাগে না, শীলা সেইকথা মাকে বুঝতে দেয় না।

শীলার মা পীরভক্ত, পীরের মুরিদ। হাসিনা খালাদের বাড়িতে ওরস মাহফিল। ঢাকা থেকে তাদের পীর বাবা আসবেন, হাসিনা খালাই শীলার মাকে এই পীরবাবার খোঁজ দিয়েছেন। অঢেল আয়োজন চলছে সে বাড়িতে। সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে উঠানে। মফস্বল শহরে ঘোষের হাতে বিরিয়ানি সবচাইতে সুস্বাদু। তার দলবল নিয়ে সে সকাল থেকে বিরিয়ানি আর দই তৈরিতে ব্যস্ত। আশপাশের বাড়িগুলোয় উৎসবের আমেজ। আব্বা আসতেসে শহর থেকে। এক বছর পর দেখা হবে। দূর দূর থেকে লোক আসবে পীরবাবার দেখা পেতে। পীর বাবা ভালোবেসে যার মাথায় ফুঁ দিবেন, তার কোন বালা মুসিবত থাকবে না। কত মানুষ এই একটা দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকে। শহরের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকা সাঁকোটা কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। রিকশাভাড়া করে মাইকিং চলছে রাস্তায়। 'ওরস মাহফিলে আসবেন পীর আহমেদ শাহ। সকলে দলে দলে যোগ দিন।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। শীলা, নূরানি, দোলাদের মত কচি বয়সী মেয়েরা পীরবাবার যেন কোন অসুবিধা না হয় সেই দায়িত্বে নিয়োজিত। মাগরিবের আজান পরলে কেমন হৈ চৈ বেঁধে যায় ছোট্ট পাড়াটায়। আতরের গন্ধ ভাসতে থাকে বাতাসে। পীরবাবা এসে গেছেন! তার গলায় গাঁদাফুলের মালা। পীর বাবা মাঝারি গড়নের ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ, ফর্সা মুখে ধবধবে চাপ দাঁড়ি। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা আর মাথায় কালো জিন্নাহ টুপি। পীরবাবার মুখে স্মিতহাসি। সাঁকো পাড় হতে হতে বলেন, 'এলাকায় এতো উন্নতি চলছে, তোমরা এই সাঁকোটার কোন ব্যবস্থা নিতে পারলা না আব্বারা!' সমস্বরে সকলে বলে ওঠে, 'আব্বা, এইবার একটা ব্যবস্থা হবেই। চেয়ারম্যান সাবকে বলা হইসে। তিনি এইবার ব্যবস্থা নিলে আমরাই চাঁদা তুলে এখানে একটা ব্রিজ করে ফেলব। আপনার অনেক অসুবিধা হয় আব্বা। এই যাত্রায় মাফ করে দিয়েন।'

পীর আব্বা স্মিতহাসি মুখে ধরে রেখে ডান হাতটা উঁচুতে তোলেন। মানুষের জটলার পেছনে ফিসফাস করতে থাকে লোকে, 'বাবা নাখোশ। এইভাবে তার মন ভাঙ্গা ঠিক না। কার ওপর যে তার এই মনোকষ্ট গিয়ে পড়ে নাই ঠিক।'

পীরবাবা হাসিনা খালার গৃহে প্রবেশ করেন। সেই বাসার সবচাইতে সুসজ্জিত ঘরটায় পীরবাবার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতভর বয়ানের আগে পীরবাবা একটু বিশ্রাম করবেন সেই ঘরে। লাল রঙের ভেলভেটের পর্দা লাগানো সেই ঘরে, চকচকে সোনালি রঙের দুইটা ফ্যান। হলুদ রঙের ফুল ফুলদানিতে। টেবিলে রাখা আঙ্গুর এবং আপেল। পীরবাবার জন্য ঘরের বাইরে গিয়ে টয়লেট সারাটা একটু দুরূহ। তিনি কেবল সকালে গুরুচাপ সামলাতেই ল্যাট্রিনে বসবেন। এর আগে তিনি সব সারবেন ঘরেই। শীলারা সেসব সামলাবে। শীলাদের বয়স কম। সামনে বিয়েশাদি হবে। এই বয়সে বাবার নেক নজরে তাদের থাকাটা জরুরি। পীরবাবা আসরে বসবার আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে ভালোবাসেন। বৃষ্টির পানি আল্লাহর নিয়ামত। সেই পানি উষ্ণ করে টাওয়েল ভিজিয়ে শীলা, নূরানিরা চেপে চেপে পীরআব্বাকে মুছিয়ে দিচ্ছে ঘাম। পীরআব্বার ফর্সা পিঠে এবং বুকে প্রচুর লোম, বয়সের কারণে সেসবও পেকে সাদা বর্ণ ধারণ করেছে। শীলাদের গা গোলাচ্ছে, বিবমিষা জাগছে। কিন্তু যদি পীরবাবা টের পায় তাদের মনের অবস্থার, সেই কথা পৌঁছে যাবে পীরের মুরিদদের কাছে। সকলেই ভাগ্যহীনতার ভয়ে উন্মাদ হয়ে যাবে। শীলা, নূরানি মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে টাওয়েল ভিজিয়ে নেয়। একজন পিঠের ঘাম মোছে, আরেকজন বুকের। পীরবাবা এরকম সময়ে গলায় একটু কাশির আওয়াজ তোলেন। নূরানি অধিক সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দাদা, পানি লাগব?' শীলা চোখের ইশারায় নূরানিকে থামাতে চায়। নূরানি ভ্যাবাচ্যাকা খায়। পীরবাবা বলেন, 'এতো ফল রেখেছ সুন্দরীরা, নাতনি আমার অতি আদরের, একটু পানি কেন রাখোনাই? আনো একটু পানি সুনামণি, গলাটা ভিজাই।' তার চোখ চকচক করতে থাকে, ঠোঁটে স্মিতহাসি। শীলার হাত ঠান্ডা হয়ে আসে। সে তার ওড়নাটাকে ডানে বামে আরেকটু টেনে দেয়। পীরবাবা আড়চোখে শীলাকে দেখে নেয় একনজর। নূরানির দিকে তাকায় পরক্ষণেই, চোখে আদেশের বাণী, ঘর ছাড়ার। নূরানি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে শীলার হাত খপ করে ধরে ফেলে পীর। বলে, 'সুনামণি, কাছে আসো। কতদিন পরে দেখা, ভুইলাই তো গেছিলাম তোমার কথা। এক বছরে আরেকটু ঠাসা হইসো দেখতেসি। আসো সুনা, কুলে বসো।' হাত কচলাতে থাকে শীলার। শীলার ঘেন্না বাড়তে থাকে, কি করবে বুঝতে পারে না। তার ইচ্ছা করছে, পীরের গালে কষে একটা চড় লাগাতে। শীলার গায়ে যে শক্তি, সে যদি পীরকে একটা সজোরে ধাক্কা লাগায়, পীরের ক্ষমতা নাই, নিজেকে সামলায়। কিন্তু শীলা দিশে পায়না, সে কি করবে বুঝতে পারে না। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা লোপ পায়। তার মাথায় ঘুরতে থাকে পাড়ার মানুষের ভাগ্যহীনতা, তাদের রোষ। তার মনে হতে থাকে, মায়ের বুক থেকে সেই সুগন্ধ সে আর পাবে কিনা। পীরের লোমশ হাত ততক্ষণে চলে গেছে শীলার বুকের মাংস্পিন্ডে, সে দাঁত চেপে হাসছে আর বুক কচলাচ্ছে। এরকম অবস্থায় নূরানি ঘরে প্রবেশ করে হাতে পানির জগ নিয়ে। পীরবাবা গলা খাঁকারি দিয়ে শীলাকে দূরে সরান। চোখের পাতা নড়ে না শীলার। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে পায়ের পাতার দিকে। নূরানি গ্লাসে পানি ঢালে। পীরবাবা অত্যন্ত মেজাজের সাথে সেই পানির গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলেন। এরপর তেজের সাথে বলেন, 'আমার পাঞ্জাবিটা দাও। আসরে বসি।'

সামিয়ানার নিচে মানুষের অরণ্য। শাড়ির আঁচল তোলা মাথায় বসে আছে পাড়ার বউরা। কেউ কেউ আলাদা করে ওড়না জড়িয়েছে শরীরে। যেই লোকটা মদে আসক্ত, যেই লোকটা গাঁজার নেশায় দুলতে দুলতে রাস্তায় হাঁটে, সেও পীরআব্বার আলোচনা শুনবে তাই শ্রদ্ধাবশত কোন নেশাই করে নাই। চুলে চুপচুপে তেল মেখে চিরুনি বুলিয়ে সুবোধ বালকের মত সিঁথি কেটে, মুখে একটা জর্দা-খয়ের-চুন মিশ্রিত পান চিবোতে চিবোতে আসরে বসেছে। বাবার বয়ান যখন মধ্যগগনে, আল্লাহর প্রেমে তখন সবাই দিশেহারা। চোখের পানিতে তাদের টিকে থাকা দায়। কোথায় গেলে আল্লাহকে পায়? 'আল্লাহ কী অন্তরে? নাকি পীরবাবার দরবারে?' সকলেই কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'সুবহানাল্লাহ!' এই পর্যায়ে পীরবাবা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারাবেন। শুরু হয়ে যায় মানুষের পীরের বুকে বুক মেলানোর পালা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হুমড়ি খেয়ে পড়েন পীরের বুকে বুক ঘষে আল্লাহকে পাবার। সেখানে পৌঁছে যায় চৌত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ সাইজের বক্ষ। পীর কাঁদতে থাকেন, পীর বলেই চলেন, জগৎ চলেই ভালোবাসায়। বান্দাকে ভালোবাসো, স্রষ্টাকে পাবে। সকলে বলো, 'সুবহানাল্লাহ!'

শীলার মা ভ্রুকুঞ্চিত করে শাড়ির আঁচল টানে। পীরের বয়ান তার কানে ঢোকে না। সে শীলাকে খুঁজতে থাকে। সে আর দাঁড়াতে পারে না, মানুষের ভিড়ে। পীরবাবার বিশ্রামের ঘরের দিকে যায়। শীলা তখনও পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে সে ঘরে, পাশে নূরানি। শীলার মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। শীলা মায়ের বুক থেকে উঠে আসা স্নেহের গন্ধে হুহু কাঁদতে শুরু করে।

মা শীলার চোখ মুছিয়ে হাত ধরে বলে, 'চল, ঘরে যাই।'